মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমগ্র রচনা

নবম খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

গ্রন্থসূচী

উপন্যাস

সার্বজনীন

॥ লেখকের কথা ॥

এই উপন্যাসের পূর্ববঙ্গত্যাগী চরিত্রগুলির মুখে তাদের কথ্য ভাষা, এমন কি, বিশেষ টানটুকু দেবারও চেষ্টা করিনি। তার কারণ, এই উপন্যাসে আরও অনেক প্রধান চরিত্র আছে যাঁরা ওভাষায় কথা বলে না, যাদের কথায় ওরকম টান নেই। এক্ষেত্রে কতগুলি চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষা বা টান দিলে চরিত্রগুলির মধ্যে একটা ভাগাভাগি এনে দেওয়া হতো।

কোন কাহিনীতে দু'চারটি বিশেষ চরিত্রকে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো যায় —তাতে চরিত্র ক'টির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। বিশেষ কাহিনীতে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া চরিত্রগুলিকে মোট দুটি ভাগ করে দু'রকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো উচিত নয়—বিশেষ করে চরিত্রগুলি যদি একই শ্রেণীর মানুষ হয়।

আমার এই উপন্যাসে কোন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা আমদানীর কোনই প্রয়োজন নেই। এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হলো সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজের কোন শ্রেণীতে ভাঙন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিরও ভেঙে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমাজ জীবনে ভাঙন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবেই।

কাজেই এই কাহিনীতে কতগুলি চরিত্রকে আরও বেশি বাস্তব করার উদ্দেশ্যে তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা দান করলে চরিত্রগুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে একটা অকারণ ও নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করা হতো, কাহিনী ব্যাহত হতো।

এই কৈফিয়ৎ দেবার কারণটা বলি। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। অন্য বইয়ে এ পর্যন্ত যত পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র এনেছি সকলকেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছি। এই কাহিনীতে সর্বপ্রথম ওরকম চরিত্রের মুখে সাহিত্যের চলতি কথ্য ভাষা বসালাম।